পঞ্চম অধ্যায়

মনোজ বসুর উপন্যাসগুলির শিল্প প্রকরণ বিশ্লেষণ

[বিষয় নির্বাচন, কথনরীতি, নাটকীয়তা, ছড়ার মন্ত্র, সংলাপের ভাষা, সাংবাদিকতার ভঙ্গি, ভাষার ব্যবহার]

শিল্পীর যাবতীয় চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা, উপলব্ধি, অনুভূতি - এক কথায় তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ শিল্পরূপকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে W.H. Hudson তাঁর An Introduction to the study of Literature অংশে বলেছেন —

> ''Plot, character, dialogue time, and place of action, style and a stated or implied philosophy of life, then are the chief elements entering into the composition of any work of prose fiction, small or great, good or bad.''[১]

শিল্পীর মনন ও মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে সাহিত্য যখন রূপময় হয়ে ওঠে, তখনই তা সার্থকতা লাভ করে।

মনোজ বসু বিশ শতকের প্রথম পাদ থেকে শুরু করে আশির দশক পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কালকে সাহিত্যে বন্দী করেছেন। এই সময়কার দেশ-কাল, রাজনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যায় পাশাপাশি বাদাবন, প্রকৃতি, গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবন তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে। মনোজ বসু বাংলা সাহিত্যে অনেক নতুন জিনিস আমদানি করে সাহিত্য-স্বাদে বৈচিত্র্য এনেছেন। বাড়িয়ে দিয়েছেন ভৌগোলিক পরিধি। তাঁর রচিত 'নিশিকুটুম্ব', 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত' ও 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই উপন্যাসগুলি বিশেষ একটি অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে রচিত। ভৌগোলিক দিক থেকে সেই এলাকা যশোরের নিম্নাংশে খুলনা - সাতক্ষীরা এবং ২৪-পরগনা জেলার অন্তর্ভূক্ত। এ দেশ জলজঙ্গলে ঘেরা, বাদাবন আর নোনা জলের দেশ।

মনোজ বসুর রচনার ভঙ্গী হলো আত্মকথনমূলক। সদালাপী মনোজ বসু তাঁর দেখার অভিজ্ঞতা ও আস্বাদন গল্পের ছলে বলতে ভালোবাসেন। এই গল্প বলা, গল্প করা যুগ যুগান্তর

ধরে মানুষের আলাপ চারিতার রীতি। এই গল্পকথন রীতিকে উৎকৃষ্ট শিল্পরূপ দেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) গ্রন্থে। পরে এই রীতিকে অনুসরণ করেছেন প্রমথ চৌধুরী। বিভূতিভূষণের অনেক রচনাতেও এই পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। গল্প বলার বাসনা থেকেই মনোজ বসুর শিল্পরীতির উদ্ভব। লেখকের কথায় –

> ''কিশোর বয়সে গল্প বলতে ভালবাসতাম। শিশুরা এসে ঘিরে ধরত। .....ফরমাস নানা রকমের, তবে সবচেয়ে প্রিয় ভূতের গল্প, বাঘের গল্প আর চোরের গল্প। মগ্ন হয়ে শুনত তারা, শুনতে শুনতে আহার নিদ্রা ভুলে যেত। বয়স বেড়ে গিয়ে জীবনের অপরাহ্ন দেখা দিয়েছে। কিন্ত গল্প বলা আজও চলছে। এখন আর মুখে বলি না, লিখে বলি। সে কালের গল্প-প্রিয় শিশু-শ্রোতাদের ভুলতে পারি নে। এখন তারা বয়স্ক - জ্ঞানী গুনী সংস্কৃতিবান। কিন্তু গল্পের পিপাসা নিঃসন্দেহে আজও অদম্য - গল্প আর মুখে শোনেন না, লেখায় পড়েন। তাঁদের তৃপ্তি দেওয়াই জীবন-সাধনা আমার। তাই নিয়ে অহরহ চিন্তা-ভাবনা।''[২]

মনোজ বসু গল্প করতে ও বলতে ভালোবাসেন বলেই চরিত্রের চেয়ে তাঁর কাছে প্রধান বিষয় গ্রামের বর্ণনা, ঐতিহ্য - সংস্কৃতির বর্ণনা এবং প্রকৃতির বর্ণনা। এগুলোই তাঁর গল্প - উপন্যাসে চরিত্র রূপ ধারণ করেছে। আত্মকথন রীতির সাহায্যে মনোজ বসু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করেছেন মানব-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আত্মকথনের আঙ্গিকেই মনোজ বসুর রচনা হয়েছে প্রাণবন্ত। 'আমার ফাঁসি হল', 'নিশিকুটুম্ব', 'পথ কে রুখবে ?', 'ছবি আর ছবি' উপন্যাসগুলিতে এর অজস্র দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি।

বিষয় নির্বাচনে মনোজ বসু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা, কল্পনা করে তিনি কিছু লিখতে যাননি, সেটির প্রয়োজনও ছিল না। জীবনের ঘাটে ঘাটে বাঁকে বাঁকে যা তিনি দেখেছেন, সংগ্রহ করেছেন, আস্বাদন করেছেন সেইসব স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর নিজস্ব সাহিত্য জগৎ। অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি এক পাও ফেলেননি। সুতরাং তাঁর সকল সৃষ্টিই হয়েছে তার নিজেরই জীবনকাব্য। শিল্প এবং জীবন এখানে পৃথক কোনো বিষয় নয়। যা জীবন তাই শিল্প। নির্বাচনী মানসিকতার পরিবর্তে দৈনন্দিন জীবনে দেখা মানুষ ও প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতার সমারোহেই গল্প-উপন্যাস জমজমাট। বিচিত্র মানুষ ও বিস্তৃত জীবন কাহিনীর গল্প রসকে পুষ্ট করেছে। 'মানুষ নামক জন্তু', 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ', 'ছবি আর ছবি', 'পথ কে রুখবে ?' উপন্যাসে মূলত ব্যক্তির সঙ্গে শিল্পীর নিবিড় জীবন অভিজ্ঞতার মিলন ঘটেছে।

উপন্যাসের কাহিনী পরিবেশনে মনোজ বসু কথক সুলভ বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। লেখক যেন দ্বিতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি অনায়াসলব্ধ সহজ ভঙ্গিতে কাহিনী বলেছেন। লেখক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সহজেই একাত্ম হয়ে যান বলেই কাহিনীর ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। আগের ঘটনা পরে কিংবা পরের ঘটনা আগে বলে নেন। যেন তিনি শুধু কথক। কোনো কোনো উপন্যাসে প্লট বলে কিছুই নেই। যেমন 'ছবি আর ছবি', 'রক্তের বদলে রক্ত' প্রভৃতি উপন্যাস। তবে উপন্যাসের চরিত্রগুলি জীবন্ত ও সচল। ফলে পাঠক-হৃদয় ও উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে একটা সহৃদয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে। 'প্রেমিক' উপন্যাসের শেষাংশে সহৃদয়তার বন্ধন লক্ষ্য করি –

> ''রুচিবাগীশরা রাগে জ্বলেন: অরিন্দম ডাক্তারের পক্ষাঘাত জানি, কিন্তু এমন কেউ নেই বোম্বেটে ড্রাইভারটার ঘাড় ধরে গোটা কতক রদ্দা কষিয়ে দেয় ? নিষ্ঠুর নরাধম দুটোই - যেমন ড্রাইভারটা তেমনি ঐ মেয়েমানুষ। কেচ্ছাকেলি চোখের উপর দেখানোর জন্য অসহায় মানুষটাকে ময়দান অবধি টেনে নিয়ে আসে।''[৩]

বাইরে থেকে দেখে শিল্পীকে সচেতন বলে মনে না হলেও শিল্পীর অন্তর্মিলনের ফলেই কাহিনী হয়েছে প্রাণবন্ত।

কাহিনী বর্ণনায় নাটকীয়তা নির্মাণ কথাসাহিত্যের অন্যতম বিষয়। মনোজ বসু কথাসাহিত্যের মধ্যে নাটকের ক্রিয়া কি রকম সমারোহময় করে তুলেছেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ছোটগল্প বর্ণনামূলক শিল্প হলেও নাটকীয়তা তার অন্যতম উপাদান। কিন্তু মনোজ বসুর গল্পে বর্ণনা আর নাটকীয়তা যেন পরস্পর জায়গা বদল করেছে। তারই ফলে গল্পাঙ্গিকে এসেছে অভিনবত্ব। 'বনমর্মর', 'উলু' প্রভৃতির গল্পই শুরু হয়েছে নাটকীয় আকস্মিকতার চমক দিয়ে। 'বনমর্মর' গল্পের শুরুতেই –

> ''মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরিপ চলিতেছে, খানাপুরি শেষ হইল এতদিনে। হিঞ্চে-কলমির দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।''[৪]

'আমি সম্রাট', 'রাণী', 'রূপবতী', 'বকুল' প্রভৃতি উপন্যাসও নাট্য চমকে উদ্ভাসিত। শিক্ষিত যুবকের করুণ মর্মন্তুদ জীবনকাহিনী, মাতৃত্বের হাহাকার, মাতৃত্ব স্বীকারের মাধ্যমে পতিতা জীবনের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়ার মত কাহিনী উপন্যাসগুলিতে স্থান পেয়েছে। ঘটনার

ঘাত-প্রতিঘাত এবং গতির তরঙ্গের ভিতর দিয়ে জীবনের নাটকীয় জটিল মুহূর্তগুলি রসময় হয়ে উঠেছে।

সরলতা, মনোজ বসুর রচনাশৈলীর প্রধান গুণ। তাঁর লেখার ভাব, ভাষা, রচনাভঙ্গি খুবই সহজ। সহজ রসের সাধক মনোজ বসুর শিল্পসাধনার মন্ত্র :

> ''Think your own thoughts, feel your own feelings. Let your heart set the rhythm to the words.''[৫]

কৃত্রিম সাজানো আড়ম্বরপূর্ণ ভাষাকে তিনি স্বীকার করেননি। বরং সহজ-সরল-অনাড়ম্বর ভাষাই মনোজ বসুর সাহিত্যচর্চার মাধ্যম। অকারণে জটিল শব্দ ব্যবহার করে রচনাকে আড়ষ্ট করায় পরিবর্তে মুখের 'আলাপী ভাষা'-কেই শিল্পের মাধ্যম করেছেন। ফলে কথকরীতির সঙ্গে অন্বিত হয়েছে এই প্রকার ভাষার বিকাশ।

প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) রচনায় প্রথম চলিত ভাষার প্রবর্তন করলেও তা স্বার্থকতা পায়নি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' (১৯১৪) প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত অর্থে চালিত ভাষার প্রচলন শুরু হয়। মনোজ বসু তাঁর প্রারম্ভিক রচনায় চলিত ভাষার পরিবর্তে সাধু ভাষাকেই সাহিত্যের মাধ্যম করেন। পরবর্তীকালে চলিত রীতিই তাঁর সাহিত্য রচনার বাহন হয়েছে। তবে সাধু ও চালিত দুই ভাষাতেই মনোজ বসু ছিলেন সিদ্ধহস্ত। চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনায় তিনি বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। চলিত ভাষার সাহিত্যে অনেক দেশীয় উপভাষা এবং মুসলমানী শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন – দেশী শব্দ: তেরিয়া, গাঁজিয়া, শালাতি, হররোজ, গহিন, মাংলা, চাট্টি, রমারম প্রভৃতি। আরবি-ফারসি শব্দ: তারিফ, শামিল, মালুম, মুরুব্বি, হালফিল, বেএক্তিয়ার প্রভৃতি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষারীতির পরিবর্তে কলকাতা কেন্দ্রিক চলিত ভাষাকেই মনোজ বসু গুরুত্ব দিয়েছেন। আঞ্চলিক ভাষা গুরুত্ব না দিয়ে এমন এক বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, যাতে ভাষা অঞ্চল বিশেষের প্রাণসম্পদ হয়ে উঠেছে। হার্ডির উপন্যাসে ballad tale-এর প্যাটার্ন এর মতই 'জলজঙ্গল' উপন্যাসের দুকড়ি, 'বন কেটে বসত' উপন্যাসের মহেশ কথায় কথায় প্রাচীন রূপকথা – উপকথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নিদ্রাবতীর দোহাই দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে বাঘকে —

"বাঘের চোখে নিদ এনে দাও মা নিদ্রাবতী, কালী আমার ডাইনে, দুধ আমার বাঁয়ে, কালীর সন্তান আমি — হেলা করলে টের পাবে মজা।"[৬]

আবার বাদায় বসতি গড়ার ব্যাপারে মহেশ বলে –

''দক্ষিণের নতুন নতুন বাদায় নিয়ে যাব তোমাদের মা-বনবিবি আর বাবা দক্ষিণ রায়ের আজ্ঞায় জীবজন্তু আমার হুকুমের দাস। কথা না মানলে মাটি আগুন করে দেব-গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে দৌড়ে পালাতে দিশে পাবে না। কামরূপ-কামাখ্যার আজ্ঞায় দানো-পরী সব মান্য করে চলে, আকাশের বায়ু নয়তো আগুন করে দেব। গুরু কাণ্ডারী ধরে লোকে ভাবসিন্ধু পার হয়, গহিন বনের কাণ্ডারী হলাম আমরা ফকির-বাউলে। চল আমার সঙ্গে।''[৭]

তুলে ধরেছেন বাদা অঞ্চলের মানুষের চলাফেরার নিয়মকানুন, সংস্কার। শাস্ত্র বহির্ভূত দেব-দেবীর পূজা এখানে বেশি। যেমন – বুড়ী ঠাকুরণ, রণচণ্ডী, রণগাজী, বনবিবি, দক্ষিণা রায়, জাগী-কালু-চম্পাবতী ইত্যাদি। মন্ত্র সংস্কৃতি বা আরবি নয়, মন্ত্র পড়া হয় গ্রাম্য ছড়ায়। যেমন-

"মা গো মা - তোর বালক আইল বনে,
শত্তুর-দুশমন দমন করে রাখিস ছি চরণে।"[৮]

অভিযোগও করে ছড়ার ছলে –

''ও ননদী পোড়াকপালি,
মিথ্যে বলে মার খাওয়ালি ?
আসুক তোর শ্বশুরের বেটা,
বলে দিব তারে —
ভাত-কাপড় না দিবার পারে,
বিয়া কেন করে ?''[৯]

ঔষধের চেয়ে টোটকা চিকিৎসায় বিশ্বাসী বাদাবনের মানুষেরা। দুকড়ি বলে –

"রোগ আরাম হবে না বাবুমশায় ? কি বলেন ? পাঁচুকালীর তাগা পরে অনেকের তো সেরে যাচ্ছে। তাগার জন্য মোহান্তবাবার কাছে যাব – তা সেখানে পুজোর খরচই সকলের আগে সাত সিকি।"[১০]

এই অঞ্চলের মানুষেরা কথায় কথায় প্রবাদ বলে। আসলে লেখক মনোজ বসু তাঁর বিভিন্ন রচনায় এরকম প্রবাদ-প্রবচনের বহুল ব্যবহার করেছেন। যেমন - 'কপালে লেখা খণ্ডানো যায় না', 'বেল পাকলে কাকের কি', 'যত দোষ নন্দ ঘোষ', 'কপালে আছে ঘি না খেয়ে করি

কি!', 'হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙে চাঁটি মারবে', 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি' ইত্যাদি।

গ্রামজীবনের আশীর্বাদ লেখককে করেছে মানবপ্রেমিক, প্রকৃতিপ্রেমিক ও রোমান্টিক। যুগগত অবসাদ জীবনচর্চাকে দুর্বল পঙ্গু করে রাখলেও নৈরাশ্য এবং হতাশার মধ্যে পথ হারাননি লেখক। প্রেম-স্নেহ-ভালবাসার মাধুর্য দিয়ে আঁকলেন পারিবারিক জীবনের প্রসন্নমধুর রূপ। রোমান্সের মুরলী বাজিয়ে আলাপ করালেন নর-নারীর প্রেমের রূপ। পূর্বরাগের পটভূমিকায় আকর্ষণ বিকর্ষণের টানাপোড়েনে প্রেম হয়ে ওঠে মধুর মিলনান্তক। রোমান্টিক জীবনশিল্পী মনোজ বসু রোমান্সের স্বপ্নাবেশে রচনা করেন - 'জলজঙ্গল', 'প্রেমিক', 'বকুল', 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'এক বিহঙ্গী', 'আগষ্ট ১৯৪২' প্রভৃতি উপন্যাস। রোমান্টিক কাব্যানুভূতির সঙ্গে কখনো যুক্ত হয়েছে গভীর মনন।

> "চোখের সামনে ঘরে ঘরে হাজার মেয়ে স্বামী পুত্র শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে ঘরকান্না করছে। আনন্দে হাসে, দুঃখে ব্যথায় চোখের জল ফেলে। তাই দেখে আমারও যদি কোনদিন নিশ্বাস পড়ে থাকে, সে দোষ আমায় দিবি নে - দোষ সেই বিধাতাপুরুষের, বিধবা জেনেও যে দেহ ভরে যৌবন বইয়ে দেয়, মনের মধ্যে ঝড় তোলে।"[১১]

জটিল অন্তর্বিশ্লেষণের পরিবর্তে দৃষ্টিভঙ্গির সরলতায় লেখক মনোজ বসুর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলি শান্ত, সুস্থ, স্বাভাবিক এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিলতা চরিত্রগুলির মধ্যে না থাকলেও আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তারা সমুজ্জ্বল। আবার বহু চরিত্র বন্ধনহীন - তারা পথ চলার নেশায় মত্ত ভবঘুরে। যেমন – কেতুচরণ, মধুসূদন, জগন্নাথ, সাহেব, মহেশ, পান্নালাল ইত্যাদি। জীবনের ছোট বড় ঘটনার স্রোতে তারা ভেসে চলেছে এক কূল থেকে অন্যকূলে। বিশাল প্রকৃতির অঙ্গনে তারা ছন্নছাড়া; পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই তাদের নেশা।

ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিকে মিলিয়ে দিতে লেখক মনোজ বসুর বাস্তব সচেতন তথ্যের প্রতি ঝুঁকেছেন। অনিবার্যভাবে সাহিত্যায়নে এসেছে সাংবাদিকতা। 'আগষ্ট ১৯৪২', 'পথ কে রুখবে?', 'মানুষ নামক জন্তু', 'মৃত্যুর চোখে আগুন' প্রভৃতি উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে সাংবাদিকতা। 'আগষ্ট ১৯৪২' উপন্যাসে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন-এর তীব্রতা ও গতিবেগ বোঝাতে লেখক ছোট ছোট সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

কংগ্রেসের অবাস্তব কর্মপন্থা এবং অহিংস আন্দোলন যুথীর মনে জাগাতে পারে না কোন প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গিকার। মহিমকে বিদ্রুপ করে তাই সে বলে —

> ''দেশসুদ্ধু লোক বন বন করে ঘোরাতে থাকলে স্বরাজ আপনি বেরিয়ে আসবে। ...কিন্তু সূতো হয় বলে স্বরাজও হবে? সৈন্য কামান জাহাজ এরোপ্লেন ঘেরা ইংরেজের রাজত্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাব।''[১১]

কাহিনীর প্রথম পর্বে সবচেয়ে দীপ্ত চরিত্র হল চন্দ্রা। কিন্তু দেশের মুক্তি-অভিযানের তরঙ্গে জনগণের মধ্যে চরিত্রগুলিও হারিয়ে গেল। আন্দোলনের জোয়ারে চরিত্রের মতো ভেসে গেল পাঠকও। 'পথ কে রুখবে?' উপন্যাসেও মল্লিকাঘাটের ওয়েটিংরুমে সময় কাটানোর কালে লেখক সাংবাদিক আয়োজন করেছেন। 'মৃত্যুর চোখে আগুন' উপন্যাসেও সাংবাদিকতার নিখুঁত সাহিত্যায়ন করেছেন সুকুমার চরিত্রের উপস্থাপনার মাধ্যমে। যা লেখকের অনন্য শিল্পভাবনার পরিচায়ক।

লেখক রাজনৈতিক চেতনা বা উদ্বাস্তু সমস্যার বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশের সময় আধুনিক মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। 'মানুষ নামক জন্তু', 'রক্তের বদলে রক্ত' উপন্যাসে যার সূত্রপাত। এই সময় থেকেই নাগরিকতার উন্মেষ ঘটেছে মনোজ বসুর সাহিত্যে। লেখক যশোহর জেলার গ্রাম প্রকৃতিকে নিয়ে প্রথম থেকেই ছিলেন মশগুল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ঐ অঞ্চল পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত হওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নষ্ট হয়েছে সম্প্রীতি। লেখককেও পাকাপাকিভাবে হতে হয়েছে শহরের বাসিন্দা। গ্রাম থেকে উৎখাত হওয়ার যন্ত্রণায় লেখক হয়েছেন আশাহত। শহরের প্রতিকূল পরিবেশে সাহিত্য রচনার প্রেরণা স্ফূর্তি পায় না। সেই পরিস্থিতির মধ্যে লেখক বাধ্য হন উদ্বাস্তু সমস্যা ও শহরের পরিবেশকে নিয়ে সাহিত্য রচনায়। 'মানুষ গড়ার কারিগর', 'রাজকন্যার সয়ম্বর', 'আমি সম্রাট' প্রভৃতি উপন্যাসে পল্লী থেকে উৎখাত হওয়া মানুষ ও শহরের মানুষজনকে আশ্রয় করে সৃষ্টি করেছেন শিল্পসম্ভার। উপন্যাসের চরিত্রগুলি শহরের বাসিন্দা হলেও গ্রামীণ সহানুভূতিতে নিষিক্ত। এই সময়ের পর থেকেই মনোজ বসু তাঁর উপন্যাসে সাহিত্যকে দিয়েছেন নতুন মাত্রা। অর্থাৎ বাস্তবতা ও রোমান্সের সমন্বয় ঘটিয়ে শহরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় সৃষ্টি করেছেন শিল্পসাহিত্য। যা তাঁকে এবং তাঁর রচনাকে গৌরবময় স্থানের অধিকারী করেছে।

তথ্যসূত্র

১. উদ্ধৃতি সংগ্রহ মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - ড. দীপক চন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১০০

২. ঝিলমিল - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৩৭৫, পৃ. ১৬৩

৩. প্রেমিক - মনোজ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., চৈত্র ১৩৭৫, পৃ. ১৯৯

৪. মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (আদি পর্ব) - ড. ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ২৭

৫. উদ্ধৃতি সংগ্রহ মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

৬. বন কেটে বসত - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., অগ্রহায়ণ ১৪১৫, পৃ. ২৩৫

৭. বন কেটে বসত - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

৮. জলজঙ্গল - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., শ্রাবণ ১৪১৫, পৃ. ০৫

৯. বন কেটে বসত - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

১০. জলজঙ্গল - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

১১. নিশিকুটুম্ব (১) - মনোজ বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯১, পৃ. ২৪৫

১২. আগষ্ট ১৯৪২ - মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, আগষ্ট ১৯৪৭, পৃ. ২২